সঞ্জীবচন্দ্রের *পালামৌ* : বহুমাত্রিক স্বরের প্রতিধ্বনি

পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তিজীবনে চূড়ান্ত ঔদাসীন্য ও অগোছালোভাব সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-৮৯) সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার পথেও হয়ে উঠেছিল বিশেষ অন্তরায়। প্রতিভার অভাব না থাকলেও স্বভাবজাত গৃহিণীপনার অপ্রতুলতার কারণে আপন প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। মেধাবী ছাত্র কিন্তু অধিক উৎসাহ দাবা খেলায়, পুষ্পোদ্যান রচনায়। আর পরীক্ষায় ফেল করা যেন তাঁর 'বিধিলিপি'। বিষয়ী পিতা পুত্রের মতি ফেরাবার উদ্দেশে চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেও পুত্রের তাতে কোনো গরজ নেই। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ছেড়ে দিলেন। সংসার অচল, দেনার পর দেনা করছেন। কিন্তু শোধ করবার কোনো দায়ই যেন তাঁর নেই। সে দায় অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের। তাঁরই নিয়মিত অর্থসাহায্যে চলছে সংসার। এ নিয়ে মাঝেমধ্যে ভাইয়ের গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়।

সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার অন্যতম লেখক ও বঙ্কিম-পরবর্তী সম্পাদক। বঙ্কিমের *বঙ্গদর্শন* শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বাঙালির সমগ্র চিন্তাচেতনায় একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। বৈশাখ ১২৭৯ থেকে চার বছর অর্থাৎ চৈত্র ১২৮২ পর্যন্ত সম্পাদনা করার পর বঙ্কিমচন্দ্র জানান—"চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ...এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।[১] সুতরাং *বঙ্গদর্শন*-এর প্রকাশ তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন। একবছর বন্ধ থাকার পর *বঙ্গদর্শন*-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সঞ্জীবচন্দ্র। সাহিত্য বিষয়ে পূর্বেকার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকলেও তাঁর সম্পাদনাকালে পত্রিকাটি ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং পিতার মৃত্যুর পর অভিভাবকহীন অবস্থায় পত্রিকাটিরও অপঘাতে মৃত্যু ঘটে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—"সম্পাদকের অমনোযোগে এবং কার্য্যাধ্যক্ষতার কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও তার নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, একবৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।...

"...পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর...সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

"কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্ম্মচারী এমন ছিল, যে, তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা এবং চক্ষুলজ্জা বশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কড়ি 'মুশুরিবাঁটা' হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।"[২]

এ তো গেল জীবনযাপনে উদাসীন, বেদিশে-বেহিসেবী সঞ্জীবচন্দ্রের কথা। কিন্তু এর বাইরেও রয়ে গেছেন আর-এক সঞ্জীবচন্দ্র। নৈহাটি কাঁটালপাড়াস্থিত বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত রয়েছে সঞ্জীবচন্দ্রের সুন্দর হাতের লেখায় পড়া বই থেকে নেওয়া পাতার

পর পাতা নোট। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা—ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বইগুলি কত মনোনিবেশ সহকারে পড়েছেন এবং আত্মস্থ করেছেন এ নোটগুলি তার প্রমাণ। এলফিনস্টোন, হান্টার, ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, হেগেল, শ্লেগেল কে নেই তাঁর সেই পড়ার তালিকায়। বিখ্যাত থ্যাকার, স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোম্পানির দোকান থেকে নিয়মিত বিদেশি বই ও পত্রপত্রিকা আনাচ্ছেন। যার কিছু রশিদ সংরক্ষিত রয়েছে বঙ্কিম-ভবনের লেখ্যাগারে। ১৮৭৪-এর একটি রশিদে কর্নহিল ম্যাগাজিন, কন্‌টেমপোরারি রিভিয়্যু, ওয়েস্টমিনিস্টার রিভিয়্যুর মতো পত্রিকার উল্লেখ পাশ্চাত্যের আধুনিক মননের প্রতি তাঁর ঔৎসুক্যতাকেই প্রমাণ করে। সঞ্জীবচন্দ্রের অচর্চিত এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে বঙ্কিম-ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী *পালামৌ* সম্পাদনাকালে ভূমিকায় তাই কিছুটা আক্ষেপের সঙ্গেই বলেন, "জীবনযাপনে যেমনই হোক, মননে মানুষটি আদৌ বেদিশে নয়। অধ্যয়নের বিষয় নির্বাচনে বরং তাঁকে রীতিমতো শৃঙ্খলাপরায়ণ বুদ্ধিজীবী মানতে হয়। বিদ্যা-অনুশীলনে তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটির কথা কেউ বললেন না, এমনকী বঙ্কিমও নয়—এ বড়ো আশ্চর্য।"[৩]

স্বভাবে সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন একেবারে মজলিশি মানুষ। ১৮৭২-এ বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র কর্মসূত্রে ছিলেন বহরমপুরে (১৮৬৯-৭৪)। সপ্তাহান্তে শনিবার কাঁটালপাড়ায় ফিরলে তাঁর নিজের তৈরি বৈঠকখানাবাড়িটি জমে উঠত সে সময়কার একঝাঁক তরুণ প্রতিশ্রুতিবান সাহিত্যিকদের আড্ডায়। বঙ্কিমচন্দ্র যার নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শনের মজলিশ'। এই মজলিশেও সমান সপ্রতিভ সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের রাশভারি ব্যক্তিত্ব তাঁর কাছে সহজে পৌঁছবার পক্ষে ছিল প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র একেবারেই বিপরীত স্বভাবের। গল্প বলিয়ে এই মানুষটি মুহূর্তেই যে কাউকে ঘনিষ্ঠ করে নিতে পারতেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও সঞ্জীবচন্দ্র পাশে না থাকলে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে থাকতেন। *জীবনস্মৃতি*-তে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁর প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথাকহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে-বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।"[৪]

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই।' তবে বঙ্কিমচন্দ্রের আশা ছিল, 'কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে।' কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। আজকের পাঠকের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র এক বিস্মৃতপ্রায় নাম। মাঝেমধ্যে আলোচনায় তাঁর কথা যেটুকু উঠে আসে তা কেবলমাত্র ওই 'মুঠিভর গদ্য' *পালামৌ* বইটির জন্য।

'প্রমথনাথ বসু' কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর প্র-না-ব ছদ্মনামে *পালামৌ* শীর্ষক রচনাটি *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ, ফাল্গুন; ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়, শ্রাবণ ও আশ্বিন এবং ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় ছয়টি অংশে প্রথম প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর

পর বঙ্কিমচন্দ্র *সঞ্জীবনী সুধা* (১৮৯৩) নামে সঞ্জীবচন্দ্রের যে রচনার সংকলন প্রকাশ করেন তাতে ষষ্ঠ অংশটি বাদে লেখাটি সংকলিত হয়। সঞ্জীব-গ্রন্থাবলীর বসুমতী সংস্করণেও *সঞ্জীবনী সুধার* পাঠই অনুসৃত হয়েছে। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রথম *পালামৌ* পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত ছয়টি অংশই সংকলিত হয়েছে।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর সঞ্জীবচন্দ্র ছোটোনাগপুরের লোহারদাগায় সেটেলমেন্ট অফিসার পদে যোগ দেন। সেটেলমেন্টের কাজে তাঁকে পালামৌ অঞ্চলে তাঁবু ফেলে বাস করতে হত। "পালামৌ, তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ভূমি, বন্য প্রদেশ মাত্র। সুহৃদ্‌প্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে; এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরি থাকে না।

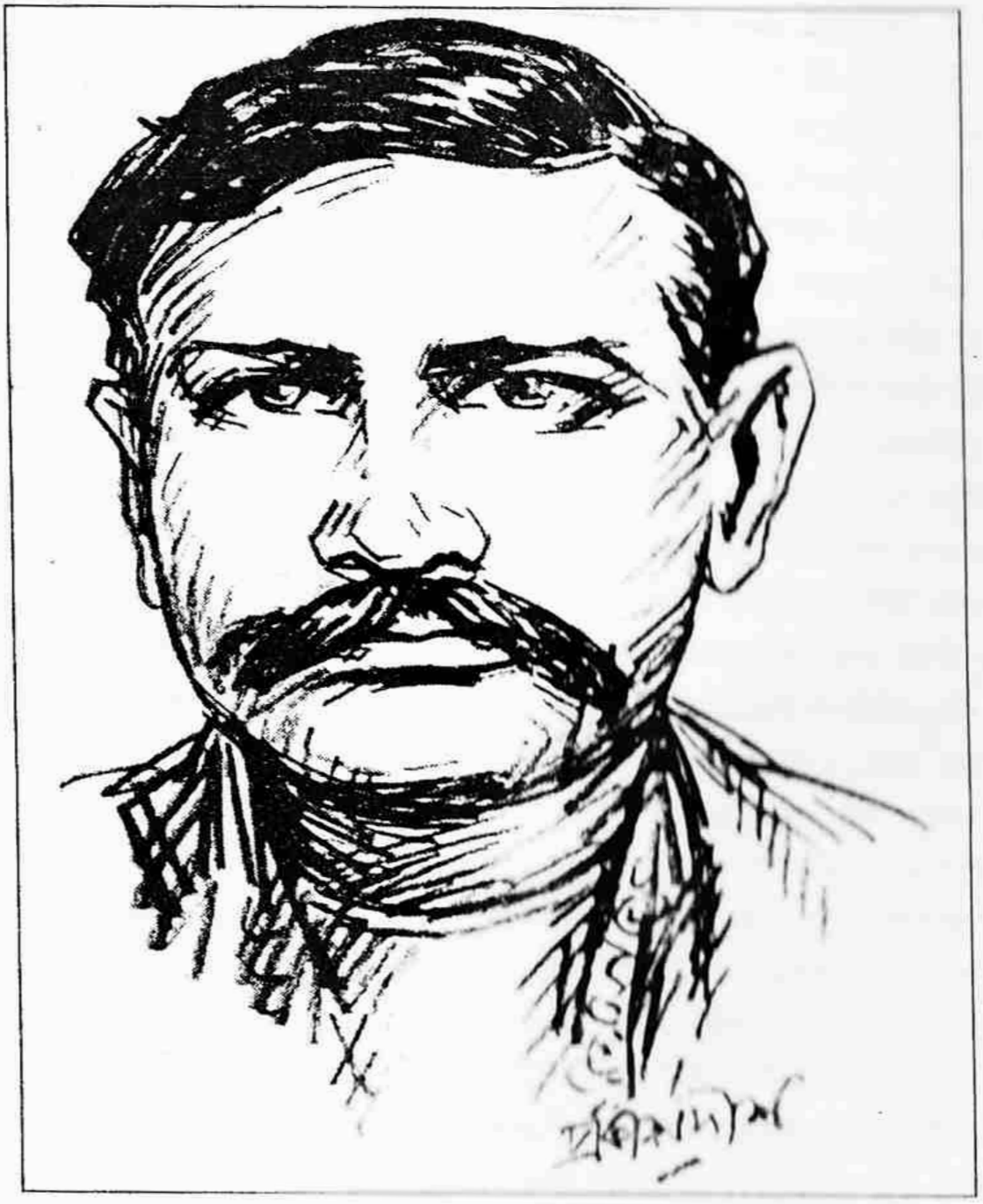

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — শিল্পী : প্রকাশ দাশ

কিন্তু তাহার চাকরি রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌ গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্প কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। 'পালামৌ' শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সংকলিত হইয়াছে তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল।"[৫]

কোনো কোনো সমালোচক *পালামৌ*-এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলেও সঞ্জীবচন্দ্র নিজে রচনাটিকে 'পর্য্যটন'-স্মৃতি বা ভ্রমণ-স্মৃতি হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। "তিন চারিটি নিরীহ ভদ্রলোক,... বঙ্গদর্শনে আমার লিখিত পালামৌ-পর্য্যটন পড়িয়াছেন, আবার ভাল বলিয়াছেন। প্রশংসা অতিরিক্ত, তুমি প্রশংসা কর আর না কর, বৃদ্ধ বসিয়া তোমায় পুরাতন কথা শুনাবে, তুমি শুন বা না শুন, সে তোমায় শুনাবে, পুরাতন কথা এই রূপে থেকে যায়, সমাজের পুঁজি বাড়ে।" (*তৃতীয় অংশ*) রবীন্দ্রনাথও রচনাটিকে উল্লেখ করেছেন 'রমণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত' রূপে। সামান্য কথাকেও সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াস দক্ষতায় অসামান্যরূপ দিতে পারতেন। সচরাচর সাধারণে যা দেখে না বা যেভাবে দেখে না সঞ্জীবচন্দ্র তা দেখতে ভালোবাসতেন এবং সেভাবে দেখবার ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল।

পালামৌ রচনাটিতে সঞ্জীবচন্দ্র যেন সৌন্দর্যের এক বিরাট পসরা সাজিয়ে বসেছেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়েছেন, "বাল্যকালে, আমার মনে হইত যে ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই রূপ; সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ, লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না।" (*চতুর্থ অংশ*)

সঞ্জীবচন্দ্রের এই মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে চন্দ্রনাথ বসু লিখছেন, "সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ইহা অতি উচ্চ কথা। এমন উচ্চ কথা এত সহজ সরল পরিস্কার ভাষায় অতি অল্প লোকেই কহিতে পারে।"[৬] রবীন্দ্রনাথও একই মত পোষণ করে বলছেন, " 'পালামৌ' ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে-একটি অকৃত্রিম সজাগ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।... 'পালামৌ'-তে সঞ্জীবচন্দ্র যে বিশেষ কোনো কৌতূহলজনক নূতন কিছু দেখিয়াছেন, অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতের সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগপূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোলরমণীই হউক, বনসমাকীর্ণ পর্বতভূমিই হউক, জড় হউক, চেতন হউক, ছোটো হউক, বড়ো হউক, সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।"[৭]

এতো গেল সৌন্দর্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্বের কথা। কিন্তু পাশাপাশি কোনো নৃবিজ্ঞানী এই অসামান্য 'পর্য্যটন' স্মৃতিটিকে আদিবাসী কোলজাতিদের বিষয়ে কায়বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের তথ্য-

আকর হিসাবেও ভাবতেই পারেন। *পালামৌ* বাংলা ভাষায় নৃতত্ত্বচর্চার প্রথমপর্বের একটি মূল্যবান কাজ। নৃতাত্ত্বিক ভ্রমণ-সাহিত্যের দাবি অগ্রাহ্য না করে বলতেই পারেন ভ্রমণ-সাহিত্যেই তো নৃতত্ত্বের আদি উৎস। নৃতাত্ত্বিক রচনার সূত্রপাত হয়েছে ভ্রমণ-সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গিকে অবলম্বন করে। ভ্রমণ-সাহিত্যের শুরুতে ভ্রমণকারী গন্তব্য স্থানে কিভাবে এলেন, এসে কি দেখলেন এবং সেই দেখায় তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হল—এই সমস্ত কিছুরই বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিকও তাঁর রচনায় ওই একই পন্থা অবলম্বন করেন। যে কোনো ক্ষেত্রসমীক্ষার বিবরণ শুরু হয় নৃতাত্ত্বিকের তাঁর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রবেশ সংক্রান্ত বিবরণ দিয়ে। অধ্যাপক প্রদীপ বসু তাঁর 'বাংলা ভাষায় নৃতত্ত্বচর্চার প্রথম অধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে *পালামৌ* প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, "ভ্রমণ সাহিত্যের একটি প্রচলিত রীতি হল ব্যক্তিগত আখ্যানের সঙ্গে সেই স্থানের প্রাণীকুল, উদ্ভিদকুল, অনুষ্ঠান, রীতি নীতির বিবরণ যোগ করা। ভ্রমণ সাহিত্যে, ব্যক্তিগত আখ্যান এবং নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্বিশেষ বর্ণনা, এই দুটি ভিন্ন ধারা প্রায়শই স্থান বদল করে চলতে থাকে। 'পালামৌ'-তেই আমরা যেমন দেখি, কোলভূমির বিবরণ, সেখানকার উদ্ভিদকুল ('তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই') বসবাসের স্থান ('সকলেরই পর্ণ কুটির'),

5th April 1887
২৪ চৈত্র মঙ্গলবার ১২৯৩
The bloody urine disappeared. Removed my ~~room to~~ Bytuck to the room down stair. Read Elphinstone's India for a couple of hours in the room, had also a short nap. In the Evening several young men came and asked me to explain, if I could, why Bunkim Babu in his Krishna Charit, announced Krishna to be the incarnation of God. They insinuated in a manner that this announcement, perhaps carelessly made has told much upon his popularity and has in a great extent pained his admirers.

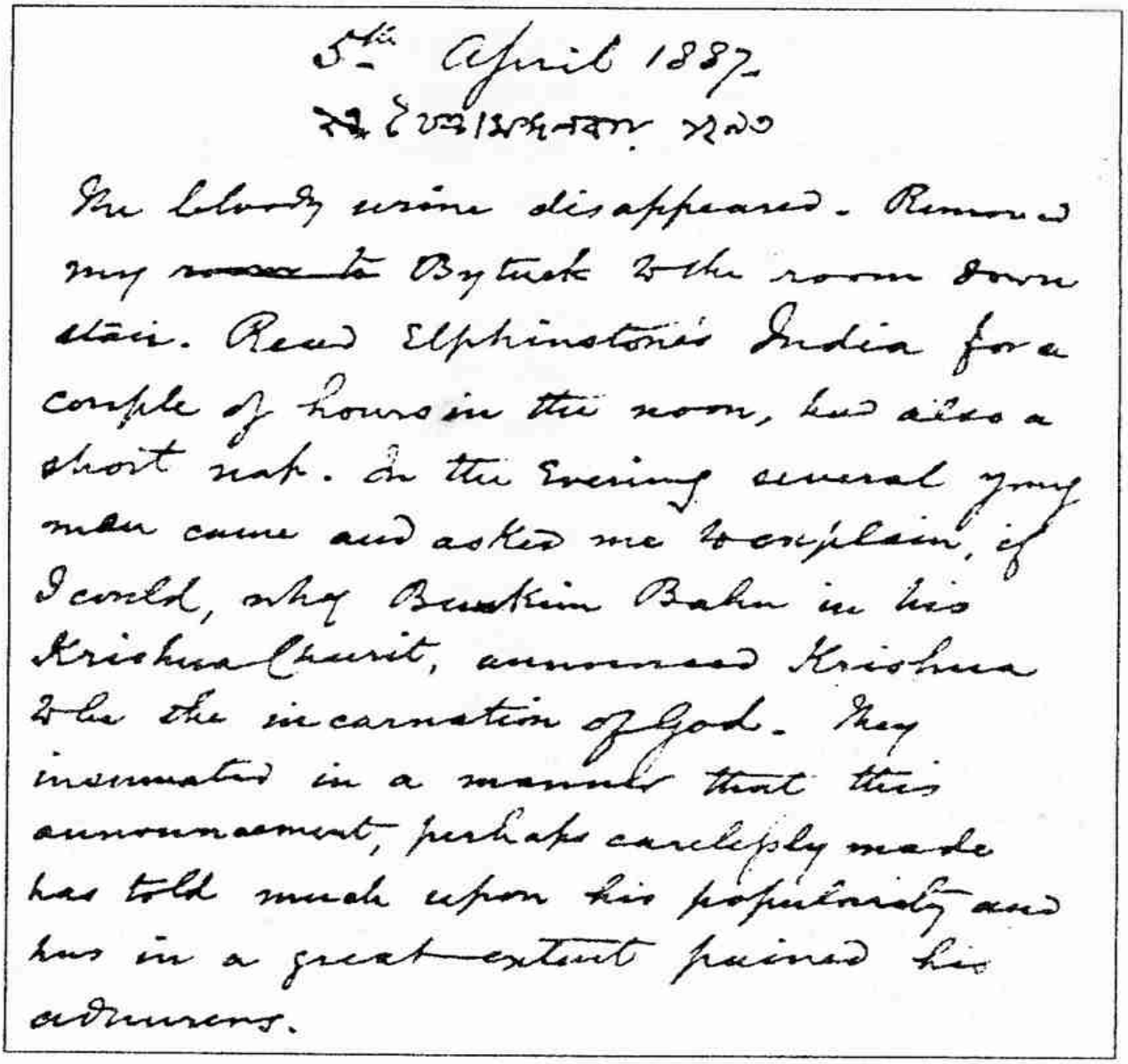

সঞ্জীবচন্দ্রের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠার প্রতিচ্ছবি

নারীদের পোষাক অলঙ্কার ('সকলের কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী ঝুলিতেছে, কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল'), অথবা কোলদের বিবাহরীতি, নৃত্যগীত, মদ্যপানের বিবরণ, এই সমস্ত কিছুই রয়েছে। ভ্রমণ সাহিত্যের এটাই সার্বজনীন রীতি। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হল, আধুনিক নৃতত্ত্বের মতো এখানেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রয়েছে নিরপেক্ষ বর্ণনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যোগস্থাপনের চেষ্টা যেমন দেখি কোলদের বিবাহ বর্ণনায়।"[৮]

কোলদের বিবাহের বর্ণনা দিতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন, "এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে।... তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদায় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্যা হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রিযাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে; কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে।

'...নৃত্য হাস্য-উপহাস্যের পর পরস্পর মনোনীত হইলে, সঙ্গী, সঙ্গিনীরা তাহা কাণাকাণি করিতে থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে। কুমারীর আত্মীয়বন্ধুরা বড় বড় বাঁশ কাটে, তীর-ধনুক সংগ্রহ করে; অস্ত্রশস্ত্রে সান দেয় আর অনবরত কুমারের আত্মীয় বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আর আস্ফালনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয় পক্ষে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।" (*পঞ্চম অংশ*)

সঞ্জীবচন্দ্রের এই বিবাহের বিবরণে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বর্ণনার সাধারণীকরণ, কারণ এই বিবরণ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা পরিবারের নয়, সমগ্র কোলজাতির। আরও লক্ষণীয়, বিবাহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কালে এবং তার ফলেই বিবাহের সাধারণীকরণ হচ্ছে। নৃতাত্ত্বিকও নিজের রচনায় এই কৌশল অবলম্বন করে থাকেন।

পালামৌ রচনাটিকে প্রধানত ভ্রমণ-সাহিত্য হিসেবেই পড়া হয়ে থাকে। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে ভ্রমণ-সাহিত্য হয়েও রচনাটি যেন নৃতত্ত্ব তথা সমাজতত্ত্বের তথ্য-আকর। নৃবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানী না হয়েও সঞ্জীবচন্দ্র বনবাসী কোলজাতির মানুষগুলোর বৈষয়িক দুর্গতির যে বর্ণনা দিয়েছেন, যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা আমাদের সামনে একজন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে : "কোলদের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখনও কখনও পনর টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়। বাঙ্গালির পক্ষে ইহা অতি সামান্য কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথা পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জ্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিতে হয়। দুই চারি গ্রাম অন্তর একজন করিয়া হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানী মহাজন কি মহাপিশাচ সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ্জ করিলে আর উদ্ধার নাই।...

নারীদের পোষাক অলঙ্কার ('সকলের কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী ঝুলিতেছে, কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল'), অথবা কোলদের বিবাহরীতি, নৃত্যগীত, মদ্যপানের বিবরণ, এই সমস্ত কিছুই রয়েছে। ভ্রমণ সাহিত্যের এটাই সার্বজনীন রীতি। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হল, আধুনিক নৃতত্ত্বের মতো এখানেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রয়েছে নিরপেক্ষ বর্ণনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যোগস্থাপনের চেষ্টা যেমন দেখি কোলদের বিবাহ বর্ণনায়।"[৮]

কোলদের বিবাহের বর্ণনা দিতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন, "এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে।... তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদায় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্যা হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রিযাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে; কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে।

'...নৃত্য হাস্য-উপহাস্যের পর পরস্পর মনোনীত হইলে, সঙ্গী, সঙ্গিনীরা তাহা কাণাকাণি করিতে থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে। কুমারীর আত্মীয়বন্ধুরা বড় বড় বাঁশ কাটে, তীর-ধনুক সংগ্রহ করে; অস্ত্রশস্ত্রে সান দেয় আর অনবরত কুমারের আত্মীয় বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আর আস্ফালনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয় পক্ষে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।" (*পঞ্চম অংশ*)

সঞ্জীবচন্দ্রের এই বিবাহের বিবরণে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বর্ণনার সাধারণীকরণ, কারণ এই বিবরণ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা পরিবারের নয়, সমগ্র কোলজাতির। আরও লক্ষণীয়, বিবাহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কালে এবং তার ফলেই বিবাহের সাধারণীকরণ হচ্ছে। নৃতাত্ত্বিকও নিজের রচনায় এই কৌশল অবলম্বন করে থাকেন।

পালামৌ রচনাটিকে প্রধানত ভ্রমণ-সাহিত্য হিসেবেই পড়া হয়ে থাকে। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে ভ্রমণ-সাহিত্য হয়েও রচনাটি যেন নৃতত্ত্ব তথা সমাজতত্ত্বের তথ্য-আকর। নৃবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানী না হয়েও সঞ্জীবচন্দ্র বনবাসী কোলজাতির মানুষগুলোর বৈষয়িক দুর্গতির যে বর্ণনা দিয়েছেন, যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা আমাদের সামনে একজন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে : "কোলদের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখনও কখনও পনর টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়। বাঙ্গালির পক্ষে ইহা অতি সামান্য কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথা পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জ্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিতে হয়। দুই চারি গ্রাম অন্তর একজন করিয়া হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানী মহাজন কি মহাপিশাচ সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ্জ করিলে আর উদ্ধার নাই।...